সংখ্যা ০৪, মে ২০১৫

লিভার বুলেটিন

LIVER BULLETIN

লিভার চিকিৎসা বিষয়ক ত্রৈমাসিক বুলেটিন

শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশ গ্যাস্ট্রোএনটেরলজি সোসাইটির বাইশতম বার্ষিক কনভেনশন ও সায়েন্টিফিক সেমিনারের প্রাক্কালে ক্রিসেন্ট গ্যাস্ট্রোলিভার এন্ড জেনারেল হসপিটালের উদ্যোগে 'লিভার বুলেটিন'-এর একটি সংখ্যা প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের এই ভাষার মাস ফেব্রুয়ারিতে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে সহজ বাংলায় লিভারের বিভিন্ন অসুখ-বিসুখ, চিকিৎসা সম্পর্কে স্বাস্থ্য সচেতনতামুলক লেখা প্রকাশের এ উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ নানা ধরনের লিভার রোগে আক্রান্ত। এর প্রবণতা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। তাৎক্ষণিক (Acute) রোগ ছাড়াও দীর্ঘদিন রোগে ভোগা এসব রোগীরা পরিবারে অন্য সদস্যদের মধ্যে ও সমাজে এ রোগের বিস্তার ঘটিয়ে থাকে। আক্রান্ত এসব ব্যক্তির পরিণতি এবং এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব অবহেলা করার মত নয়। জন্ডিস ও লিভার রোগের বিভিন্ন কারণ, এদের বিস্তার ও নিরাময় সম্বন্ধে নানা কুসংস্কার আমাদের দেশে প্রচলিত আছে; যার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। ঝাড়-ফুঁক, মালা পড়া, গোসল করানো, অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হারবাল, গাছ-গাছড়ার রস ইত্যাদি বরং জটিলতার কারণ হতে পারে। অপচিকিৎসাজনিত কারণে অনেকের মারাত্মক জটিলতাসহ মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আমাদের মতো দেশে ঢাকার বাইরে বেশিরভাগ অঞ্চলেই এসব রোগ যথাযথ শনাক্তকরণ, চিকিৎসা-পরামর্শ কিংবা প্রতিরোধের পর্যাপ্ত সুযোগ নেই। প্রায়শই চিকিৎসা অত্যন্ত জটিল ও ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। লিভার রোগ প্রতিরোধের প্রধান উপায় হচ্ছে স্বাস্থ্য-শিক্ষা, সঠিক জ্ঞান ও গণসচেতনতা। এ ক্ষেত্রে এ ধরণের একটি পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। যারা এ উদ্যোগের সাথে আছেন, তাদের মেধা ও শ্রম দিচ্ছেন তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই।

লিভার রোগ নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক, সরকারী-বেসরকারী সবাই মিলে ব্যাপক সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া দরকার। একটি শিশু জন্মগ্রহণ করার পরপরই তাকে আজন্ম প্রতিরোধের নিরাপদ ছায়াবেষ্টনীতে নিয়ে আসতে হবে। 'সুস্থ শিশু, সুস্থ মা, সুস্থ জাতি' হোক আমাদের কাম্য।

অধ্যাপক ডা. এম আর খান

সম্পাদক
ডা. মো: শাহিনুল আলম
নির্বাহী সম্পাদক
ডা. আবু হেনা আবিদ জাফর
সহকারী সম্পাদক
ডা. মো: আকমত আলী দিপু
ডা: মুহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফি
ডা. গোফরান সাদেক মাসুম
ডা. সাজ্জাদ মাহমুদ

ব্যবস্থাপনা সহযোগী
মো: মাহবুব আলম
মো: আসাদুজ্জামান
শহীদুল্লাহ মাসুদ
প্রোডাকশন এডিটিং
বায়োফার্মা ডিজাইন হাউস
প্রকাশক
ডা. লকিয়ত উল্লা

লিভার সুখে ও দুঃখে

অধ্যাপক মবিন খান

লিভার শরীরের সর্ববৃহৎ অঙ্গ। আকৃতিতে যেমন বৃহৎ, প্রয়োজনীয়তার দিক থেকেও এটি অতি গুরুত্বপূর্ন। শরীরকে সুস্থ রাখতে দরকার শুধু লিভার। অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত লিভার আমাদের জীবনে বয়ে নিয়ে আসে দুঃখ, কষ্ট এমনকি অকালে প্রস্থান। অন্য যে কোন যন্ত্র বা মেশিনের মতো আমাদের দেহে যন্ত্র ও চলে শক্তির সাহায্যে। এ শক্তি আসে খাদ্য থেকে। আমরা যেরুপ খাবার খাই তা থেকে সরাসরি শক্তি উৎপন্ন হতে পারেনা। জটিল খাবার লিভারে প্রক্রিয়াজাত হয়ে শক্তি উৎপাদানের উপযোগী হয়ে জমা থাকে এবং প্রয়োজন মাফিক শরীরের কোষে কোষে পৌছে শক্তি উৎপন্ন করে। তাই লিভারকে বলা হয় শক্তির পাওয়ার হাউস। শুধু তাই নয়, শরীরে উৎপন্ন বিভিন্ন দুষিত পদার্থ লিভার বিশুদ্ধ করে এবং পরবর্তীতে শরীর থেকে বের করার ব্যবস্থা করে। অনিচ্ছাকৃত বা ইচ্ছাকৃত ভাবে শরীরে কোন বিষাক্ত পদার্থ প্রবেশ করলে লিভার সেটিকে বিষমুক্ত করে। বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন জাতীয় পদার্থ তৈরি করে যা শরীরের জন্য অপরিহার্য।

লিভারের যত রোগ

গুরুত্বপূর্ন এই অঙ্গটি নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হতে পারে। কিছু রোগ বংশগত, কিছুরোগ অর্জিত। কিছুরোগ স্বল্পস্থায়ী এবং পুরোপুরি ভালো হয়ে যায়। কিছুরোগ দীর্ঘস্থায়ী, যা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে কেড়ে নেয় জীবন- এমনকি চিকিৎসা করা সত্ত্বেও হেপাটাইটিস বা লিভারের প্রদাহ বিশ্বজুড়ে লিভারের প্রধান রোগ। নানা কারনে এই প্রদাহ হতে পারে। যার অন্যতম কারন এ, বি, সি, ডি, ই, নামক হেপাটাইটিস ভাইরাস। পানি ও খাবারের মাধ্যমে সংক্রামিত হেপাটাইটিস এ, ই ভাইরাস লিভারের একিউট হেপাটাইটিস বা স্বল্পস্থায়ী প্রদাহ সৃষ্টি যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরোপুরি সেরে যায়। দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহের জন্য দায়ী হেপাটাইটি বি, সি, ডি ভাইরাস। অনেক কারনে লিভারে প্রদাহ হতে পারে। ভাইরাস ছাড়াও অতিরিক্ত এলকোহল পান, লিভারে চর্বি জমা হওয়া, বিভিন্ন ড্রাগ ও কেমিক্যালস হেপাটাইটিস করে থাকে। অটোইমিউন হেপাটাইটিস, উইলসন্স ডিজিজস সহ বিভিন্ন অজানা করনজনিত রোগ ও বংশগত রোগে লিভারে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে। যে কারণেই প্রদাহ সৃষ্টি হউক না কেন, দীর্ঘস্থায়ী বা ক্রনিক হেপাটাইটিস বছরের পর বছর চলতে থাকলে লিভারের কোষগুলো মরে যায়। অকার্যকর ও অপ্রয়োজনীয় ফাইব্রাস টিস্যু সেস্থান দখল করে জন্ম দেয় সিরোসিস নামক মারাত্মক রোগ। সিরোসিস হলে লিভারের কার্যক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। আমাদের দেশে হেপাটাইটিস বি, সি সংক্রামনই লিভার সিরোসিসের প্রধান কারন। উন্নত বিশ্বে এ স্থান দখল করে আছেঅতিরিক্ত মদ এবং এলকোহল পানজনিত হেপাটাইটিস। এছাড়া সাম্প্রতিক কালের বিভিন্ন গবেষনায় উঠে আসা ফ্যাটি লিভার, লিভার সিরোসিসের অন্যতম কারন হয়ে দাড়িয়েছে আমাদের দেশে সিরোসিসের দ্বিতীয় প্রধান কারন হিসেবে এটি দায়ী বলে ধারনা করা হচ্ছে।

ডায়াবেটিস, রক্তে চর্বির উচ্চমাত্রা প্রভৃতি কারণে শরীরের বিভিন অঙ্গের মত লিভারে ফ্যাট জমে লিভার সিরোসিস হয়। এছাড়া ব্যাকটেরিয়া এবং প্যারাসাইট লিভারে এ্যাবসেস বা ফোঁড়া তৈরি করতে পারে। সর্বোপরি প্রানঘাতি ক্যান্সারও ভর করতে পারে লিভারে। সিরোসিস যাদের হয় তাদের এ ক্যান্সার হওয়ার প্রবনতা বেশি।

হেপাটাইটিস ভাইরাস কিভাবে ছড়ায়

দুষিত খাবার ও পানির মাধ্যমে হেপাটাইটিস এ ও ই ছড়ায়। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের মত বাংলাদেশেও বড়দের জন্ডিস এর প্রধান কারন হেপাটাইটি ই ভাইরাস। ঘরে বাইরে আমরা যখন থাকি, তখন খোলা খাবার, পানি , ফলের রস ইত্যাদির উৎসহ যাচাই না করে খেতে অভ্যস্ত অনেকেই। এতে আক্রান্ত হই জন্ডিসে। তাছাড়া শহরে পানি সরবরাহ লাইনে ভাইরাসের সংক্রামন হয়ে জন্ডিস ছড়িয়ে পড়ার ঘটনাও নতুন কিছু নয়। তাই ফুটিয়ে পানি খাওয়া আর বেছে বুঝে খাবার খাওয়ার বিকল্প নেই। এতে শুধু হেপাটাইটিস এ এবং ই নয় বরং টাইফয়েডে আর ডায়রিয়ার মত আরো অনেক পানিবাহিত রোগ থেকে বাঁচা যাবে।

রক্ত ও ব্যাক্তিগত অনৈতিক আচরনের মাধ্যমে ছড়ায় হেপাটাইটিস বি ও সি ভাইরাস। দুষিত রক্ত গ্রহন বা দুষিত সিরিঞ্জ ব্যবহারের মাধ্যমে অনেকেই নিজের অজান্তে এ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। একই শেভিং রেজার, ব্লেড কিংবা ক্ষুর ব্যবহারের মাধ্যমে এ দুটি ভাইরাস ছড়াতে পারে। হোটাইটিস বি ভাইরাস আক্রান্ত মায়ের সন্তানের জন্মের পর বি ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা ৯০ভাগ। তবে মায়ের দুধের মাধ্যমে বি ভাইরাস ছড়ায় না। সামাজিক মেলামেশা, যেমন হ্যান্ডশেক বা কোলাকলি এবং রোগীর ব্যবহার্য সামগ্রী, যেমন গ্লাস জামা কাপড় ইত্যাদির মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায় না।

কিভাবে বুঝবেন আপনার হেপাটাইটিস হয়েছে কি না?

একিউট হেপাটাইটিসে ক্ষুধামন্দা, শরীর ব্যাথা, বমিভাব, কিংবা বমি এবং কিছুদিনের মধ্যে প্রসাবের রং ও চোখ হলুদ বর্ন ধারন করে। এ সময় শরীরে চুলকানি দেখা দিতে পারে। জন্ডিস ক্রমে বেড়ে যেয়ে ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

ক্রনিক হেপাটাইটিস বা সিরোসিসের প্রাথমিক পর্যায়ে বেশির ভাগ রোগীর উপসর্গ থাকে না বললেই চলে। কেউ কেউ দূর্বলতা, অবসন্নতা বা ক্ষুধামন্দা অনুভব করতে পারে। হেপাটাইটিস বি ও সি অনেকাংশে নিরাময় যোগ্য রোগ হলেও এডভ্যান্সড লিভার সিরোসিস অথবা লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত রোগী প্রায় শারীরিক কোন অসুবিধা অনুভব করে না। এসব রোগীদের পেটে পানি জমে পেট ফুলে যেতে পারে, রক্ত বমি বা কালো পায়খানা কিংবা অজ্ঞান হয়ে জীবনের ঝুকির সম্মুখিন হতে পারে। এ সময় শরীর জীর্ন শির্ণ হয়ে যায়। আমাদের দেশে অনেকে বিদেশ যাওয়ার প্রাক্কালে রক্ত পরীক্ষার সময়, বা রক্ত দিতে গিয়ে বা ভ্যাকসিন দিতে গিয়ে অনেকেই হেপাটাইটিস বি ইনফেকশনের কথা প্রথম জানতে পারেন।

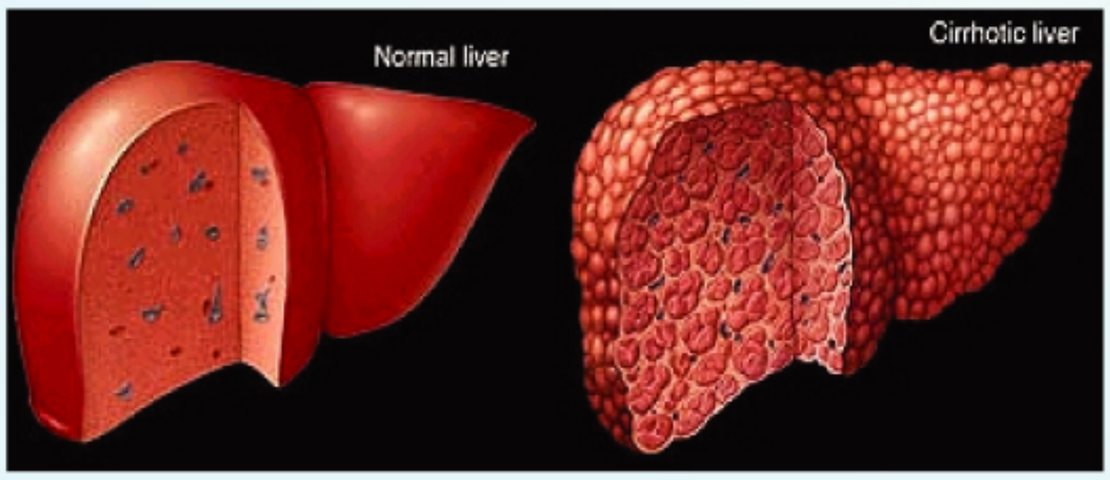

লিভারের রোগ হলে কি করবেন

লিভারের রোগীর কোন উপসর্গ দেখা দিলে বা সন্দেহ হলে অথবা আপনার শরীরে ভাইরাসের সংক্রামন নিশ্চিত হলে দেরী না করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো হয় লিভার বিশেষজ্ঞের পরামর্শ। তিনি আপনার রোগ নির্নয় করে এর কারণ, রোগের জন্য সৃষ্ট জটিলতা এবং রোগের বর্তমান অবস্থা জেনে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও উপদেশ দিবেন। হেপাটাইটিস এ এবং ই জনিত রোগ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভালো হয়ে যায়।

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে জটিলতা দেখে দিতে পারে। হেপাটাইটিস ই ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে ২৮% গর্ভবতী মা মারা যায়। যখন শেষ তিন মাসের সময় মা তীব্রভাবে হেপাটাইটিস ই প্রদাহে ভোগেন। অন্যদের ক্ষেত্রে জীবন সংহারী একিউট হেপাটিক ফেইলিউর নামক জটিলতা দেখা দিতে পারে। তাই জন্ডিসকে কখনও অবহেলা করবেন না। ক্রনিক হেপাটাইটিসের জন্য দায়ী হেপাটাইটিস বি ও সি এর বিরুদ্ধে কার্যকর ঔষধ গুলির সবই এখন আমাদের দেশে পওয়া যায়। তাই এ ক্ষেত্রে ও হতাশা না হয়ে লিভার বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

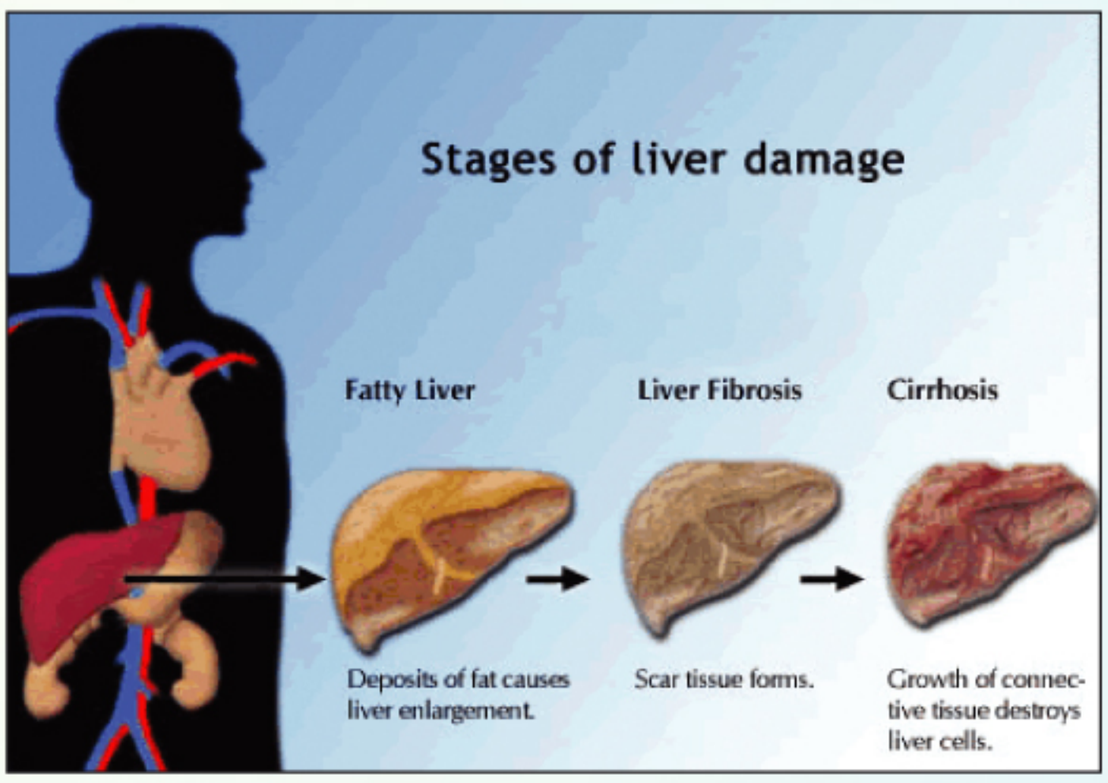

লিভার রোগ প্রতিরোধে আপনার করণীয়

- হেপাটাইটিস বি এর টিকা নিন
- ঝুকি পূর্ণ আচরন যেমন- অনিরাপদ যৌনতা, একই সুঁই বা সিরিঞ্জ বহুজনে ব্যবহার পরিহার করুন।
- নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন ও ডিসপজেবল সুই ব্যবহার করুন। ব্লেড, রেজার, ব্রাশ, খুর বহুজনের ব্যবহার বন্ধ করুন।
- শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রন করুন।
- শাক সবজি ও ফলমুল বেশি করে খান আর চর্বি যুক্ত খাবার কম খান।
- মদ্যপান ও অন্যান্য নেশা জাতীয় দ্রব্য পরিহার করুন।
- বিশুদ্ধ পানি ও খাবার গ্রহন করুন।
- ডায়াবেটিস ও হাইপারটেনশন নিয়ন্ত্রেনে রাখুন।
- পরিস্কার পরিছন্ন থাকুন।

শেষ কথা

মানুষের দেহে একটি মাত্র লিভার আছে এবং জীবন ধারনের জন্য এটি অপরিহার্য। তাই লিভারের অসুস্থতার ফলাফল ক্ষেত্র বিশেষ হতে পারে ব্যাপক ও ভয়াবহ। তবে লিভার রোগ মানে সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়া নয়। সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ নিরাময় এবং অনিরাময় যোগ্য ক্ষেত্রে জটিলতা মুক্ত মোটামুটি স্বাভাবিক ভাবে জীবন নির্বাহ করা যায়।

রক্তবমি ও কালো পায়খানা

ডা. মো: শাহিনুল আলম

রক্তবমি ও কালো পায়খানা যে কোন রোগীর জন্য এশটি গুরুতর বিপদ সংকেত। মনে রাখতে হবে যে এ রকম লক্ষন রোগীর জন্য সর্বদা জরুরী অবস্থা নির্দেশ করে। দ্রুত ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ না নিলে এটি মৃত্যুর কারণও হতে পারে। রক্ত বমি হওয়াকে হেমাটেমেসিস বলে। আলকাতরার মত কালো নরম পায়খানাকে মেলিনা বলে।

কারণসমুহ

বিভিন্ন কারনে খাদ্যনালীর উপরের অংশ (Esophagus), পাকস্থলী (Stomach), ডুওডেনাম (Duodenum) এ রক্তক্ষরণ হলে রক্তবমি ও কালো পায়খানা হয়ে থাকে। যে সমস্ত কারণে রক্তক্ষরণ হয় তা হলোঃ

১. খাদ্যনালীর আলসার (Peptic Ulcer)
২. অ্যাসপিরিন (Aspirin) কিংবা অন্য কোন ব্যাথানাশক (NSAID) ঔষধের জন্য খাদ্যনালীতে ক্ষত হলে (Erosion)
৩. ইসোফেগাসের ভ্যারিক্স থেকে (Esophageal Varices)
৪. পাকস্থলীর ক্যান্সার থেকে।

খাদ্যনালীর রক্তক্ষরণের জন্য মুলত ঃ এ ৪ টিই ধাপই প্রধান কারণ। অন্যান্য ছোট খাটো কারণেও রক্তক্ষরণ হতে পারে। তবে সেগুলো অত গুরুত্বপূর্ণ নয়।

রোগের লক্ষণ

সাধারণত: রোগীর আকস্মিকভাবে কালো পায়খানা এবং রক্তবমি হতে পারে। আবার পূর্বে এরকম হবার ইতিহাস থাকতে পারে। আর রক্তবমি ও কালো পায়খানা কোনো রোগের নাম নয়। বিভিন্ন রোগের প্রকাশিত লক্ষণ মাত্র। এজন্য মুল রোগের লক্ষণসমুহ পূর্ব থেকেই থাকতে পারে। যেমনঃ পেপটিক আলসার ও লিভার সিরোসিস থাকতে পারে। কম পক্ষে ৬০ এম এল রক্তক্ষরণ হলে কালো পায় খানা হতে পারে। রক্তক্ষরণের লক্ষণ দেখা দিতে হলে শরীর থেকে কমপক্ষে আধা লিটার রক্তক্ষরন হতে হবে। রক্তক্ষরণের অন্যান্য লক্ষণ গুলো হলো মাথা হালকা বোধ হওয়া ঘেমে যাওয়া, পানির পিপাসা লাগা, শরীর ঠান্ডা হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। এমনকি বেশি রক্ত ক্ষরণ হলে রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

পরীক্ষা নিরীক্ষা ও চিকিৎসা

রক্তবমি ও কালো পায়খানা হলে রোগীকে দ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা অনিবার্য। পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করা ঠিক না। এজন্য চিকিৎসা শুরু করে দিয়ে পক্ষে আনুষাঙ্গিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়।

১. রক্তবমি ও কালো পায়খানা হলে প্রথম কাজই হলো শিরা পথে স্যালাইন শুরু করে দেয়া
২. এরপর রোগীকে পরিপূর্ণ পর্যবেক্ষন করতে হবে। কি পরিমান রক্তক্ষরণ হয়েছে, প্রস্রাব কমে গিয়েছে কনা, জন্ডিস , পেটে পানি আছে কিনা, প্লীহার আকার বড় কি না কিংবা সিরোসিসের অন্যান্য লক্ষণ আছে কিনা দ্রুত সেসব দেখতে হবে। এছাড়াও অন্যান্য গুরুতর কোন রোগ আছে কিনা তাও ক্ষতিয়ে দেখতে হবে।
৩. দ্রুত রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষা করতে হবে। যেমনঃ কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, ইউরিয়া, ইলেক্ট্রোলাইট, লিভার ফাংশন টেষ্ট, প্রোথ্রোম্বিন টাইম ইত্যাদি। কমপক্ষে ২ ব্যাগ ব্লাডের জন্য ক্রস ম্যাচিং করাতে হবে।
৪. রোগীকে প্রয়োজনমত স্যালাইন ও রক্ত দিতে হবে।
৫. রোগী অজ্ঞানহলে অক্সিজেন দিতে হবে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
৬. এন্ডোস্কোপীঃ রোগী স্থিতাবস্থায় আসলেই এন্ডোস্কোপী করতে হবে। এন্ডোস্কোপী করলে শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষেত্রেই রক্ত ক্ষরণের কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। অনেক সময় এন্ডোস্কোপীর মাধ্যমে রক্তক্ষরণ বন্ধ করাও যায়। যেমনঃ আলসার থেকে রক্তক্ষণ হলে এডরেনালিন (Adrenaline) ইনজেকশন, এলকোহল (Alcohol) ইনজেকশন দিয়ে রক্তক্ষরণ বন্ধ করা যায়। এটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সাফল্যজনক ভাবে এটি করতে পারলে আর অপারেশনের প্রয়োজন হয় না। ভ্যরিসিয়াল (Variceal) রক্তক্ষরণ হলে এন্ডোস্কোপি করে স্ক্লেরোথেরাপী (Sclerotheraphy) বা ব্যান্ডিং করতে পারলেও রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়।
৭. মনিটরিংঃ রোগীকে নিবিড় পর্যবেক্ষন করতে হয়। কারণ রক্তক্ষরণ বন্ধ নাও হতে পারে। আবার রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে পূণরায় শুরুহতে পারে। এজন্য নিয়মিত পালস, ব্লাড প্রেসার এবং প্রস্রাবের পরিমান দেখতে হবে।
৮. অপারেশনঃ যদি এন্ডোস্কোপী করে রক্তক্ষরণ বন্ধ করা না যায় কিংবা পূণরায় রক্তক্ষরণ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অপারেশনের প্রয়োজন হতে পারে।

উপসংহার

রক্তবমি ও কালো পায়খানা একটি মারাত্মক উপসর্গ। দ্রুত এর চিকিৎসা প্রয়োজন। সকল আধুনিক চিৎসার পরও এক্ষেত্রে মৃত্যুর হার শতকরা ১০ ভাগ, বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার আরো বেশি । অতএব অধিকাংশ রোগী এখনো মৃত্যুর ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। অতএব রক্তবমি ও কালো পায়খানা হলে রোগীকে দ্রুত আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা সম্বলিত হাসপাতালে স্থানান্তর করা অতীব জরুরী।

ওজন তত্ত্ব, ওজন তথ্য

ডাঃ মোঃ আকমত আলী, ডাঃ ফরিদা ইয়াসমিন রিনা

ওজনদার বা মোটা মানুষের সঠিক সংখ্যা পৃথিবীতে মোট কত তার সঠিক হিসাব এ মুহূর্তে বলা সম্ভব না হলেও মানুষ কেন মোটা হয় তা নিয়ে গবেষণার শেষ নেই। কোমর ব্যথায় দাঁড়াতে পারছে না, এই রোগীকে যদি বলা হয় ভাই আপনার খাওয়া কন্ট্রোল করেন, তিনিও বলেন, ডাঃ সাহেব, আমি তো কিছুই খাই না, আমার ওজন কমে না কেন? সাধারণ জ্ঞানের কথা হচ্ছে, আপনি কতটুকু খাচ্ছেন সেটা বড় কথা না, যা খান তা যদি আপনার চাহিদার তুলনায় বেশি হয়, তাহলে আপনার ওজন বাড়বে।

সাধারণ মানুষ বনাম মোটা মানুষ

সুদর্শন হতে কে না চায়? চিকনা পটকা দেহের জন্য দুশ্চিন্তার যেন শেষ নেই। আহা! যদি আমার শরীরটা আর একটু মোটা হতো। এই ইরাদা পোষণ করার মত মানুষের সংখ্যা নেহায়েত কম নয় । চিকন মানুষের জন্য সুসংবাদ হল জীবন মান বিচারে তারা মোটা মানুষের চাইতে অনেক এগিয়ে। মোটা মানুষের যে শুধু শারিরিক কষ্ট তা নয়, আর্থিক ভাবেও অনেক ক্ষতি, তাছাড়া একটি দেশের স্বাস্থ্য খাতের একটি উল্লেখ যোগ্য অংশ মোটা হওয়া জনিত সমস্যার কারনে খরচ হয়। হিসাবে দেখা গেছে যে, স্বাস্থ্য খাতে মোট ব্যয়ের ১-৩ ভাগ মোটা মানুষের শারিরিক জটিলতার জন্য খরচ হয় যা আমেরিকায় বেড়ে দাঁড়ায় ৫ থেকে ১০ ভাগ।

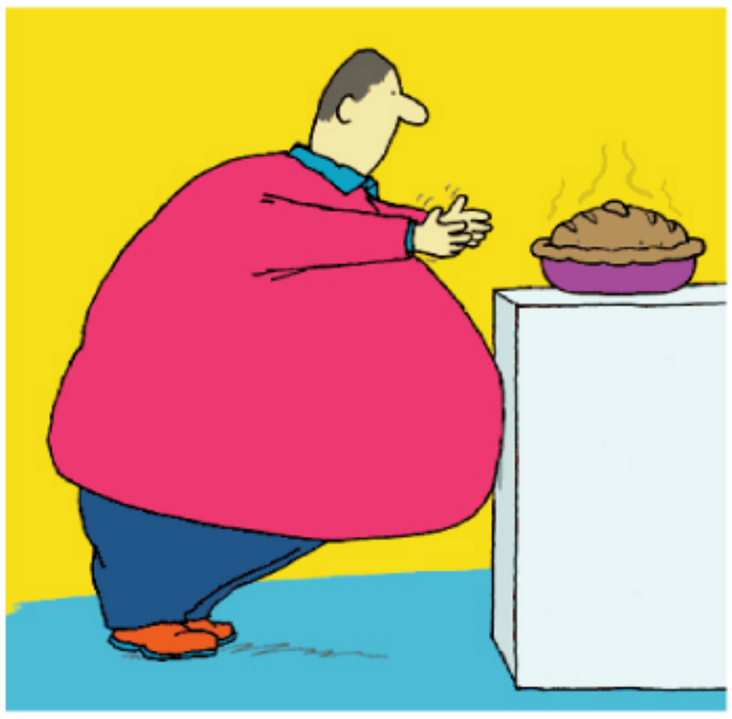

অতিরিক্ত ওজন হলে যত সমস্যা তার মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, বাত, কোমর ও হাঁটুর ব্যাথা, ফ্যাটি লিভার, পতন জনিত ফ্রাকচার এর অতিরিক্ত ঝুঁকি অন্যতম।

মোটা মানুষের পরিসংখ্যান

Yiran Guo, Ph.D এর গবেষণা রিপোর্টে বিশ্বে মোটা মানুষের সংখ্যা প্রায় ৫০ কোটি; আমেরিকায় প্রতি তিন জনে এক জন। বিশ্বে ১৯৮০ এর দশকে যেখানে প্রতি দশ জনে এক জনেরও কম মোটা মানুষ ছিল, সেখানে ২০২০ সাল নাগাদ পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রতি ৩ জনে ২ জনই মোটা মানুষের দলে ভীড় জমাবে। মোটা মানুষের হার তুলনামূলক ভাবে জাপান ও কোরিয়াতে শতকরা ৪ জনের মতো, যা আমেরিকা আর মেক্সিকোতে ৩০ জন বা তারও বেশি। আবার পুরুষের তুলনায় মহিলাদের মোটা হবার হার কিছুটা বেশি, এদিকে কম শিক্ষিত মহিলাদের মোটা হবার প্রবনতা উচ্চ শিক্ষিত মহিলাদের তুলনায় বেশি, যা দুই থেকে তিন গুণ। দেখা গেছে যে, অতি স্থুল ব্যাক্তির আয়ু সাধারণ মানুষের চাইতে ৮ থেকে ১০ বছর কম; আমেরিকাতে কর্ম ক্ষমতা হারানোর হার সাধারণ মানুষের তুলনায় দশ ভাগ বেশি।

মোটা হওয়ার নতুন তথ্য

যেসব অসুখে মানুষ মোটা হয় তা বাদ দিলে যে ভাবে শরিরের ওজন বাড়ে তা হল ভারসাম্যের বিচ্যুতি, অর্থাৎ শরিরের ক্যালরি খরচ না হলে পর্যায়ক্রমে ওজন বাড়া শুরু হয়। দেখা গেছে যে, শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট এর শতকরা প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ ভাগ চর্বিতে রূপান্তরিত হতে পারে যদি খাওয়ার পর তাকে খরচ করা না হয়। কিন্তু একটি কথা প্রায়ই শুনতে হয় যে আমার চাইতে অমুক তো বেশি খায়, তার ওজন বাড়ে না কেন? দেখা গেছে যে, মানুষের কিছু জিন এই ক্ষেত্রে ভুমিকা রাখতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা আলামত পেয়েছেন। TOMM40-APOE-APOC1, SREBF2 এবং NTRK2- জিন সমূহ মানুষের মোটা হবার পিছনে ভুমিকা রাখে বলে Yiran Guo তাঁর অতি সাম্প্রতিক গবেষণায় জানিয়েছেন।

মোটা হবার নতুন কারখানা আবিষ্কার

এতদিন মোটা হবার জন্য যেসব অঙ্গ দায়ী বলে ধরা হত তার গুরুত্বপূর্ণ সারিতে লিভারকে রাখা হয়নি। বলা হত পাকস্থলী আর মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম কারসাজির ফলে মানুষ মোটা হয়। কিন্তু এ বছরেই অস্ট্রেলিয়ার মলেকুলার ওবেসিটি ল্যাবরেটরির কতক বিজ্ঞানী জানালেন যে, লিভার থেকে ফ্রুকটোজ ১, ৬- বাই ফস্ফেটেজ বা এফ বি পি-এজ, যা গ্লুকোজ উৎপাদন করে এই এনজাইমই মোটা না হবার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। এই জায়গায় মোটা ব্যাক্তিগন সুখের ঢেকুর উঠাতে পারেন এই ভেবে যে, আমি কম খাব কেন যখন লিভারই আমার ওজন নিয়ন্ত্রণ করে। মজার ব্যাপার হচ্ছে এফ বি পি-এজ স্বাভাবিক খাবারের ক্ষেত্রে মোটা হবার বা না হবার দায়িত্ব নেয় না; যখন অতিরিক্ত শর্করা এবং চর্বি খেয়ে ফেলি, তখনই এফ বি পি-এজ এই ভুমিকাটা নেয়। বিটা লেপ্টিন যেমন ক্ষুধা লাগার প্রবাণতা কমিয়ে ওজন কমাতে সাহায্য করে তেমনি এফ বি পি-এজ এর ওভার এক্সপ্রেশন মস্তিষ্কে নেগেটিভ সিগন্যাল পাঠিয়ে অতিরিক্ত ওজন নিয়ন্ত্রণ করে বলে তাঁরা তথ্য পেয়েছেন। তাইতো এফবি পি-এজ কে দমন করে ডায়াবেটিস এর চিকিৎসা করা কঠিন হচ্ছে, কারন গ্লুকোজ কমাতে গিয়ে শরীরের ওজন বেড়ে যাচ্ছে। তবে এই এফবি পি-এজ কে ভিজা বেড়াল ভাবার কোন কারন নাই, রক্তের সুগার বাড়ার পাশাপাশি অনেক ক্ষতি করার জন্য এর ভূমিকা রয়েছে।

পরিশেষে

কারন যা-ই হোক না কেন খাদ্য নিয়ন্ত্রণ না করে এবং শারিরিক পরিশ্রম না করে এই দুনিয়ায় কম মানুষ-ই ওজন কম রাখতে পেরেছেন; আর এ পর্যন্ত এর বাস্তবায়নের জন্য কম খেতে বাধ্য করতে ব্যারিয়াট্রিক সার্জারি-এর চেয়ে আর কোন পদ্ধতি বেশি কার্যকর হয়নি। তাহলে শেষমেষ কি দাঁড়ালো? যেই লাও সেই কদু। কম খান, চিকন থাকুন।

মহান বিজয় দিবস ২০১৪ উপলক্ষে ক্রিসেন্ট গ্যাস্ট্রলিভার ও জেনারেল হাসপাতাল এর উদ্যেগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ক্যাম্পে কয়েকশ রোগী বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট থেকে সেবা গ্রহণ করে।

Stool Transplant, Foecal Microbiota Transplant

(মল প্রতিস্থাপন)

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) শেখ মোহাম্মদ বাহার হোসেন

মানুষ ও পরিবেশ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। আর তাই দেখা যায় একজন সুস্থ মানুষের অন্ত্রে ৩০০ - ১০০০ ধরনের বিভিন্ন জীবানু বসবাস করে, যা পরস্পরের জন্য দরকারী (Mutualistic)। মানুষের অন্ত্র থেকে খাদ্যপ্রাণ গ্রহণ করে এরা যেমন নিজেরা বেঁচে থাকে, মানুষকে সুস্থ রাখার জন্য এরাও ক্ষতিকারক জীবানু অপসারণ, ভিটামিন তৈরী থেকে শুরু করে বিভিন্ন metabolic ও Immunnological কাজ করে। এজন্য অনেক বৈজ্ঞানিক Intestinal flora কে একটা সম্পূর্ণ organ বা তার চেয়েও বেশী কিছু বলে মনে করছেন। অসুস্থার কারণে মানুষকে যখন নানাবিধ এন্টিবায়টিকস্, এন্টিক্যান্সার বা ইমুনোসাপ্প্রেসিব ওষুধ গ্রহন করতে হয় তখন অনেক সময় এই উপকারী ফোরা মরে যায় এবং তার স্থানে Cl difficile নামক ভয়ংকর জীবানুর সংক্রমন হয়ে pseudomembranous colitis নামক জীবন হানিকারক মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে। এতে দিনকে দিন রুগীর ওজন কমতে থাকে, জ্বর হতে থাকে, জটিল ধরনের পাতলা পায়খানা হতে থাকে। vencomycin বা ততোধিক শক্তিশালী এন্টিবায়ওটিকস্ও এমন ক্ষেত্রে রোগ সারাতে ব্যর্থ হয়। আর তখনই দরকার পড়ে সুস্থ মানুষের অন্ত্রে থাকা জীবন রক্ষাকারী Intestinal flora। এদেরকে Commensal বা তিকারক নয় এমন মনে করা হলেও আসলে এরা সুস্থ জীবনের জন্য অত্যন্ত দরকারী। একজন মানুষের তাঁর অন্ত্রে থাকা দরকারী Intestinal flora নষ্ট হয়ে যখন দুষ্ট Cl difficile জীবানু দ্বারা আক্রান্ত হন এবং pseudomembranous colitis এর মত মারাত্মক রোগে ভুগতে শুরু করেন তখন সুস্থ মানুষের হাগুতে থাকা অসংখ্য Intestinal flora কোলনে প্রতিস্থাপন করাকেই Stool Transplant বা হাগু প্রতিস্থাপন বলে। শুনতে খুব খারাপ শোনালেও মোদ্দা কথা হচ্ছে হাগু খাইয়ে দেয়া। অনেক আদি কালেও বিষ খাওয়া রোগীকে বমি করার জন্য হাগু খাইয়ে দেয়া হতো। শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবার জন্য অন্ত্রে দরকারী প্রতিরোধী জীবানু জন্মানোর প্রয়োজনে জন্মের পর পর অনেক সমাজে এখনও নবজাতককে সামান্য হাগু খাইয়ে দেয়ার রেওয়াজ চালু আছে, তবে জন্মের আগে শিশু মায়ের পেটে থাকা কালীন সময় নিজের বর্জ্য মিশ্রিত লাইকর খেয়েইত বেঁচে থাকে, তাই জন্মের পর নূতন করে তাকে আর হাগু খাওয়ানোর প্রথা অবৈজ্ঞানিক।

অনেকে হয়ত জানেন পৃথিবীতে এক গ্রুপ মানুষ আছেন যারা সুস্থ থাকার নামে নিজের বর্জ্য নিজে গ্রহণ (Coprophagic) করেন। ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী মুরালজী দেশাই প্রাতঃরাশে প্রতিদিন এক গ্লাস নিজ মূত্র পান করতেন (urophagic)। আর এখানে সাধারনত পায়খানার রাস্তায় ডুষের মাধ্যমে বা কলোনোস্কপির মাধ্যমে কোলনে, নাকে টিউব দিয়ে ক্ষুদ্রান্তে ৫০০ এমএল-এর মত processed stool প্রতিস্থপন করা হয়। আজকাল ক্যাপসুলে ভরা হাগুও (open Biome) মুখে খাওয়ার জন্য পাওয়া যায়। রুগী সুস্থ হতে এক বা একাধিক ডোজ লাগতে পারে। সুস্থ যে কেউ এ খেত্রে দাতা হতে পারেন, অনেকে নিকট আত্মীয়, বা স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে দাতা হিসাবে পছন্দ করেন। তাতে যদিও কোন সমস্যা নাই তবে দেখতে হবে একই পরিবেশে থাকার কারণে দাতা যেন উপসর্গবিহীন Cl difficile-এ আক্রান্ত- না হন। তিনিই সুস্থ দাতা যিনি গত ৩-৬ মাস কোন এন্টিবায়ওটিকস্ খাননি, যিনি কোন hepatitis A, B, C, E বা HIV'র মত কোন রোগে আক্রান্ত-নন, যার অন্ত্র পরজীবিমুক্ত।

Autologus Stool Transplant হিসাবে এন্টিবায়ওটিকস্ খাওয়ার আগে সুস্থ Intestinal flora-সমৃদ্ধ নিজের হাগু সংরক্ষণ করে পরে অসুস্'তার সময় তা দিয়েও চিকিৎসা করতে পারে। তবে এক্ষেত্রেও নিজের Cl difficile দ্বারা আক্রান্ত- হবার সম্ভাবনা থেকে যায়।

Pseudomembranous colitis

Pseudomembranous colitis ছাড়াও আজকাল অন্য colitis, IBD, IBS, কোষ্ঠকাঠিণ্যসহ বিভিন্ন স্থুলতা বা Parkinsonism, multiple sclerosis এর মত স্নায়ু রোগও Stool Transplant দিয়ে চিকিৎসার চেষ্টা চলছে। আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে চতুর্থ শতাব্দী থেকে চীন দেশে এই চিকিৎসা চালু থাকলেও তেমন প্রচার ছিলনা। ২০১৪ সালের ২৬ মে BBC, pseudomembranous colitis আক্রান্ত এক রুগীর চিকিৎসায় Stool Transplant-এ সফলতার খবর প্রচার হবার পর থেকে এ নিয়ে হৈ চৈ পড়ে যায়। পরে জানা যায় ১৯৫৮ সন থেকে খোদ আমেরিকাতেও এই চিকিৎসা গবেষনার পর্যায়ে চলে আসছিল এবং ২০১৩ সালে US FDA -এর মত বনেদী প্রতিষ্ঠানও এই চিকিৎসার অনুমতি দিয়ে রেখেছে।

সংবর্ধনা

পিত্ত রোগের কথকতা

ডা. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী

মিসেস হা. এর বয়স পঁয়তাল্লিশ। এ নিয়ে তিনবার ভর্তি হলেন হাসপাতালে। আগে ছিলো শুধু পেটে ব্যাথা। উপরের পেটে, খানিকটা মাঝ বরাবর এবং ডানে বক্ষপিঞ্জরের নীচে। অনেক সময় ব্যাথাটা সহনীয় পর্যায়ে থাকলেও পরবর্তীতে অসহনীয় হতে থাকে। পেছনদিকে ডানপাশের সোল্ডার ব্লেডের নীচ পর্যন্ত যাচ্ছে। প্রথমে অল্প কিন্তু পরে আস্তে আস্তে তীব্রতর হয়ে উঠে, ৪-৫ ঘন্টা ধরে থাকে এবং অসহ্য ব্যথায় গড়াগড়ি, ব্যথানাশক ঔষধ, ইঞ্জেকশন বা সাপোজিটরী ব্যবহারে কমে আসে।

শুরুটা হয়েছিলো বছর দেড়েক আগে। পেটব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হলো। আল্ট্রাসনোগ্রাম করে দেখা গেল পিত্তথলিতে পাথর (Gall Stone)। সার্জনের পরামর্শে অপারেশন করা হলো। ক'দিন কাটলো বেশ ভালো। এরপর আবারো ফিরে এলো ব্যথা। প্রথম প্রথম অপারেশনের সাথে সম্পর্কিত ব্যথা মনে হলেও তীব্রতায় যেমন, তার সাথে যোগহলো বমি, কাপুনি দিয়ে জ্বর। আবারো হাসপাতলে ভর্তিহয়ে উপসর্গ উপশম হলো। পুনরায় আল্ট্রাসনোগ্রাম করা হলেও তেমন কিছু পাওয়া গেলনা। ছুটি নিয়ে তিনি বাড়ীগেলেন। কিন্তু আবার যখন ব্যাথা শুরুহলো এবারে তিনি গেলেন গ্যাস্ট্রে এন্টেরোলজীস্টের কাছে। পরীক্ষায় দেখাগেল লিভার এনজাইমগুলো (ALP, AST, ALT) বেড়েগেছে। ALP অনেক বেশী। MRCP পরীক্ষা করে পাওয়াগেল পিত্তনালীতে দুটো পাথর (Choledocholithiasis,)। এযাত্রায় অবশ্য অপারেশন নয়, ERCP এর মাধ্যমে অপসারন করা হলো পাথর।

ফ' আদ্যাক্ষরের নামের এক অষ্টাদশী তরুণী একইরকম ভাবে বেশ ক' বছরের ব্যথা নিয়ে ভর্তি হয় দেশের শীর্ষস্থানীয় এক সরকারী হাসপাতালে। অনেক পরীক্ষার পরে সিটিস্ক্যানে দেখা গেল লিভারের বাম অংশের প্রধাননালী জুড়ে অনেক পাথর (Hepatolithiasis)।

উপরন্তু জন্ডিস এবং কাঁপুনিদিয়ে জ্বর থাকায় ERCP করে স্টেন্টিং করার পর উপশমের পর অপারেশন করে লিভারের বাম অংশ বাদদেয়া হলে সে স্থায়ী ভাবে সুস্থহয়ে উঠে।

শ' আদ্যাক্ষরের নামের এক দ্বাদশী মেয়ে একইরুপ ব্যথা, জ্বর, জন্ডিস নিয়ে ভর্তি হয় উক্ত শীর্ষ হাসপাতালে। তারপেটের ডানদিকের উর্ধাংশে চাপাব্যথার সাথে ফোলা কিছুর অস্তিত্ব বোঝা যায়। পরীক্ষায় দেখা গেল পিত্তনালী অনেকটা শালগমের মতো (Choledochal Cyst) দুপ্রান্তে সরু আর মাঝখানটা ফোলা। উপসর্গ নিরাময়ও সার্জারীর মাধ্যমে যা চিকিৎসা করা হয়।

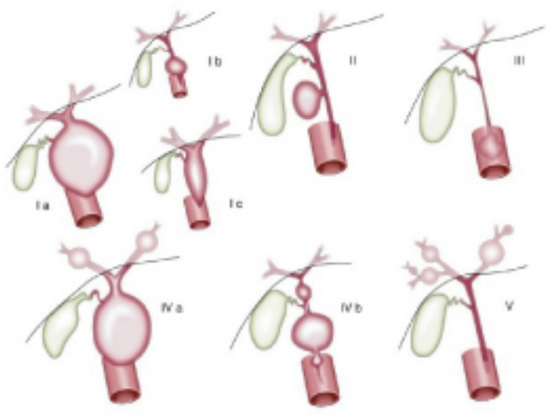

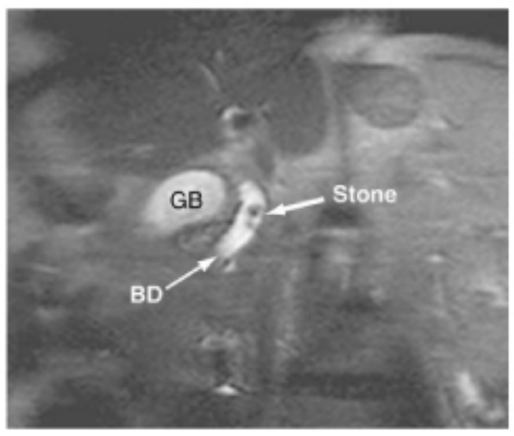

উপরোক্ত বর্ননার মাধ্যমে পিত্তথলী ও পিত্তনালীর পাথর, লিভারে পাথর, জন্মগত পিত্তরোগের কিছু ধারনা দেয়ার চেষ্টা আমরা করেছি। এর বাইরে শৈশবে অগঠিত পিত্তনালী (Congenital Biliary Atresia) জীবানুজনিত নানা সংক্রমন (Empyema, Cholangitis), কৃমি সংক্রমন (Biliary Ascariasis) পিত্তনালীর সংকোচন (Stricture), পিত্তথলী ও নালীর নানাবিধ ক্যান্সার (Carcinoma Gall Bladder), Cholangio carcionoma, Carcinoma Head of the Pancreas, Peri ampullary Carcinoma). এর বাইরে রয়েছে সার্জারী জনিত জটিলতা (Surgical biliary leakage, Post surgical biliary stricture). অনেক সময় খাদ্যনালীতে তৈরী হওয়া গর্ত (Duodenal diverticulum,), পিত্তনালীমুখের সমস্যা (Sphincter Oddi Dysfunction- SOD). এছাড়া কোন পাথড় পিত্তনালীথেকে গড়িয়ে এসে অগ্নাশয়মুখে প্রবেশ করলে বা মুখ বন্ধ করে দিলে হয়ে যায় প্রাণঘাতী অগ্নাশয় প্রদাহ (Acute Biliary Pancreatitis).

কেন হয়?

জিনগত কারণ ছাড়াও, পিত্তরসের ঘনত্ব বেড়ে যাওয়া, লিভারে চর্বি তৈরী ও নিঃসরন বেশী হওয়া, খাদ্যনালীর চলন কম থাকা, জীবানু সংক্রমন, বয়সের সাথে, জন্মগতভাবেই পাথড়হবার প্রবণতা, ডায়বেটিস, সিরোসিস, পিত্ত প্রবাহজনিত বাধা, কৃমি সংক্রমন, বা অজ্ঞাত কারণে পিত্ত সংক্রান্ত রোগ ও এর বিবিধ জটিলতা হয়ে থাকে।

কিভাবে জানা যাবে?

শতকরা ৭৫ ভাগ ক্ষেত্রে পিত্তথলির পাথরের কোন উপসর্গ থাকেনা, তাই তারা রোগসম্পর্কেও জানেন না। বাকী ২৫ ভাগ ৰেত্রে নানাবিধ জটিলতা নিয়ে আবির্ভূত হয়। তাই পেটে ব্যথার সাথে অন্যান্য উপসর্গ এবং লিভার ফাংশন টেস্ট, ও ইমেজিং (USG, CT scan, MRCP, EUS, ERCP) এর মাধ্যমে পিত্ত সংক্রান্ত রোগ সম্পর্কে জানা যায়।

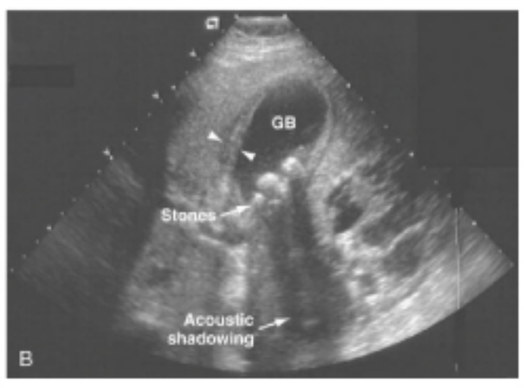

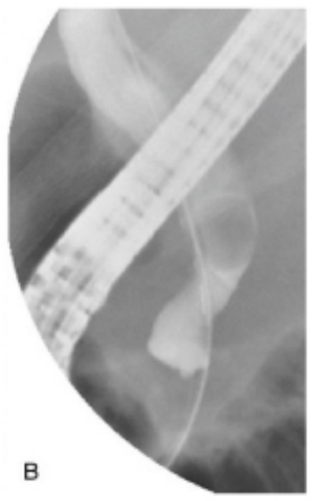
B

চিকিৎসা

সাধারনভাবে, পেটেব্যথা সহঅন্যান্য উপসর্গ না থাকলে পিত্তথলির পাথরের চিকিৎসা প্রয়োজন হয়না। চিকিৎসা প্রধানত সার্জিকাল। তা সে খোলা বা এন্ডোসকপিক, যাই হোক। উপসর্গ ও জটিলতা (CBD stone, Biliary pain, Gall stone pancreatitis) এবং ঝুঁকি থাকলে অপারেশন ও এন্ডোসকপির মাধ্যমে (Lap Choly, open surgery, ERCP, Lobar resection etc) পিত্তসঞ্চালন তন্ত্রের নানা রোগের চিকিৎসা করা যায়।

পিত্তপাথরের মেডিক্যাল চিকিৎসা

ইদানিং আলোচিত পিত্তপাথরের ঔষধ প্রয়োগে বিগলন চিকিৎসা, কিডনি পাথরের ন্যায় ভাঙা অথবা অন্যান্য হার্বাল এবং হোমিওপ্যাথি ইত্যাদি কোনটিই আশাব্যঞ্জক নয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে বিনামূল্যে ঠোঁটকাটা ও তালুকাটার ক্যাম্পেইন সম্পন্ন

মানুষের জীবনে হাসি এক অমূল্য সম্পদ, কখনো কখনো কারো জীবনে সে হাসি বিস্বাদে রুপ নেয়। ভেতর থেকে হাসি আসলেও জন্মগতভাবে কিছু মানুষ সৃস্টিকর্তার এক অমোঘ নিয়মে বাধা পড়ে,স্বাভাবিকভাবে হাসতে পারেনা। মানবতার কল্যাণে সেই অস্বাভাবিক কিছু মানুষকে স্বাভাবিকভাবে মুখে হাসি আনবার প্রয়াসে আজ ৭ এপ্রিল, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে ক্রিসেন্ট গ্যাস্ট্রোলিভার এন্ড জেনারেল হাসপাতালে বিনামূল্যে ঠোঁটকাটা ও তালুকাটার চিকিৎসা সম্পন্ন হয়েছে। "জার্মান বাংলাদেশ ক্লেফ্ট প্রজেক্টে"র সহযোগিতায় ডা. এ এম জিয়াউল হকের তত্বাবধানে এবং বিশিষ্ট প্লাষ্টিক সার্জন ও সহযোগী অধ্যাপক ডা. মো. কামরুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি বিষেশজ্ঞ টীম ১০জন রোগীর সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অপারেশন করেন।

ক্রিসেন্ট গ্যাস্ট্রোলিভার এন্ড জেনারেল হাসপাতালটি মূলত: সর্বাধুনিক চিকিৎসা সম্বলিত বিষেশায়িত হাসপাতাল। এখানে গত এক যুগ ধরে পরিপাকতন্ত্র ও লিভার, নিউরো-মেডিসিন, নিউরো-সার্জারীসহ অন্যান্য ডিসিপ্লিনের উন্নতমানের ও নিরাপদ চিকিৎসা সেবা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে এ হাসপাতালের উদ্যোগে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্ত-র্জাতিক দিবস উপলক্ষ্যে ফ্রী হেলথ্ ক্যাম্প, লিভার ক্যাম্পসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়াও গরীব ও অসহায় রোগীদের হাসপাতালের ফ্রী বেডে ভর্তিসহ অন্যান্য সার্ভিসে বিশেষ ছাড় দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবারো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিনামূল্যে ঠোঁটকাটা ও তালুকাটার চিকিৎসা প্রদান করল।

কেস হিস্ট্রি

৩৫ বছর বয়স্ক শিল্পী বেগমের যখন প্রথম পেটে ব্যথা হয় তখন তিনি ৮ মাসের গর্ভবতী। পেটের ডান দিকে উপরের অংশে ব্যথা নিয়ে দেখা করেন টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে স্থানীয় ডাক্তারের সাথে। সেখান থেকে কিছু ঔষধ খেয়ে তার ব্যথা কমে যায়। এরপর বাচ্চা জন্মদানের দুই মাস পর্যন্ত কোন ব্যথা হয়নি। বাচ্চার বয়স দুই মাস পার হবার পর হঠাৎ একদিন শিল্পী বেগম আবারও পেটের উপরের অংশে ডানদিকে ব্যথা অনুভব করেন। এবার ডাক্তারের সরনাপন্ন হলে পেটের আল্ট্রসোনোগ্রাম করার উপদেশ দেয়া হয়, যেখানে ধরা পড়ে পিত্তথলির পাথর। যেহেতু দুগ্ধপায়ী ২ মাসের বাচ্চা ছিল তাই ডাক্তার কিছু ঔষধ দেন এবং আরো কিছুদিন অপেক্ষার পর যেন অপারেশন করান সেই উপদেশ দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। এতে শিল্পী বেগম বেশ ভাল ছিলেন, তাই আর অপারেশন করাননি।

২ বছর পর আবার আগের মতোই ব্যথা হয়। এবার তিনি চলে আসেন ঢাকার সাভারে এক হাসপাতালে যেখানে তার ল্যাপারোস্কোপিক (পেট না কেটে, ফুটো করে ক্যামেরার মাধ্যমে অপারেশন) কোলেসিস্টেকটমি করে পিত্তথলি ফেলে দেয়া হয়। এরপর অনেকদিন ভাল ছিলেন। কিন্তু তার দুই বছর পর উনার খাদ্যে অরুচি, বমি ভাব ও কিছুদিন পর জন্ডিস দেখা দেয়। এবার উনি কবিরাজের কাছে জন্ডিস ঝাড়াতে যান। কিন্তু এতে কোন ফল না পেয়ে শুরু করেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা। বেশ কিছুদিন এসব চিকিৎসা নিয়ে কোন ভাল ফল তো হলই না উল্টা তার উপসর্গ বাড়তে থাকে এবং এবার শুরু হয় শরীরে চুলকানী। এসব উপসর্গ নিয়ে টাঙ্গাইলের কুমুদিনি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় উনাকে। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ধরে পরে পিত্তনালী থেকে পিত্তরস বের হতে পারছে এবং সেই মুখটি চিকন হয়ে গেছে। পরে সেখানকার ডাক্তার রোগীকে রেফার করেন ঢাকার বংগবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকল বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিছুদিন ঘোরাঘুরি করেও উনারা আসন স্বল্পতার কারনে ভর্তি হবার সুযোগ পাননি। শেষে চলে আসেন গ্রীনরোডে অবস্থিত ক্রিসেন্ট গ্যাস্ট্রোলিভার হাসপাতালে এবং সেখানে ডাঃ বিধান চন্দ্র দাসের অধীনে ভর্তি হন। ডাঃ বিধান চন্দ্র রোগীর সকল অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও আনুষঙ্গিক পরীক্ষার ভিত্তিতে অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নেন।

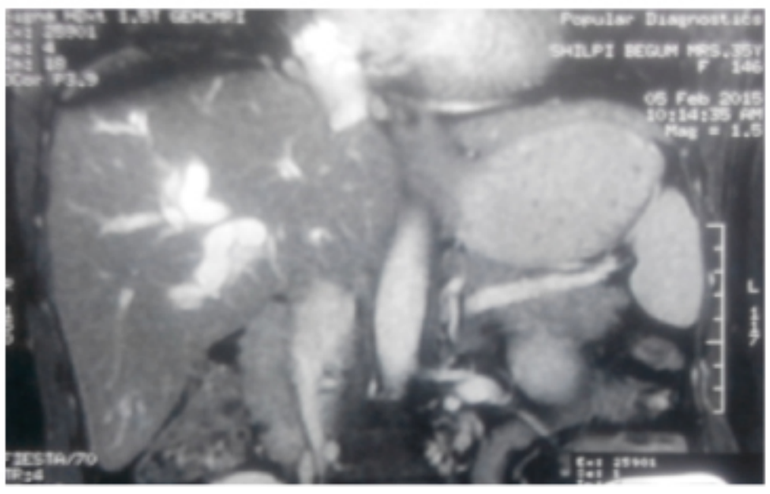

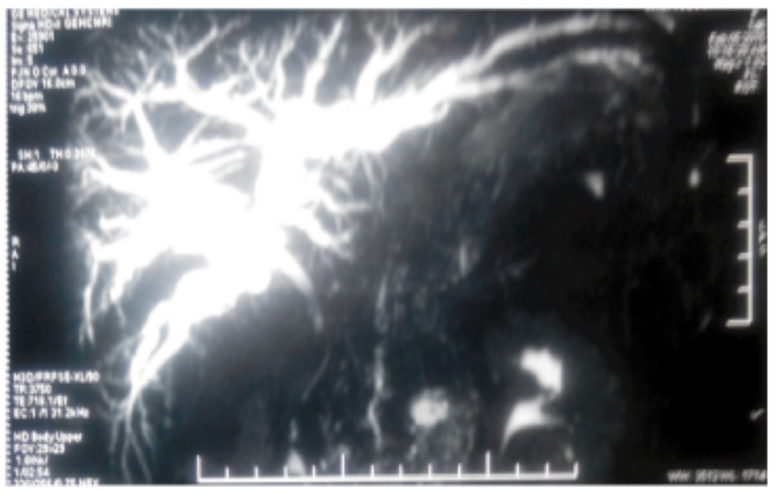

অপারেশন করার সময় যকৃতনালীগুলো ও পিত্তনালী আলাদা করা খুব দুষ্কর ছিল। এগুলো বের করার পর দেখা যায় উনার পিত্তনালী নিচের দিকে সংকুচিত হয়ে প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। যাকে মেডিকেলের ভাষায় বলে Type- IV Biliary Stricture (Near Confluence); সেই সাথে যকৃতে পিত্ত জমা হয়ে বড় হয়ে গেছে। প্রায় সোয়া পাঁচ ঘন্টা ব্যাপী অপারেশনে উনার দুই যকৃতনালীর সাথে পৃথকভাবে অন্ত্রের (জেজুনাম) অংশ যুক্ত করে দেয়া হয় এবং পিত্তনালীতে একটি কৃত্রিম নল (stent) প্রতিস্থাপন করা হয়। অপারেশন পরবর্তী কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। কিছুদিন হাসপাতালে থেকেই রোগীর জন্ডিস ও অন্যান্য উপসর্গ কমে যায় এবং শিল্পী বেগমের দীর্ঘদিনের কঠিন রোগের চিকিৎসা শেষ হয়। পরবর্তীতে ফলোআপে জানা যায় উনি বেশ সুস্থই আছেন।

3rd International Hepatology Conference in Dhaka album

NCE DAILY
inPro
Omeprazole
20 mg & 40 mg Capsule,
40 mg IV Injection

Domperidone
Esogut
10 mg Tablet, 15 ml PD
& 60 ml Suspension

Lactulose
Lactu
100 & 200 ml oral Solution

BIOPHARMA
LIMITED